প্রধানমন্ত্রীর ইন্দোনেশিয়া সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম প্রধানদেশ ইন্দোনেশিয়া সফরে গেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এই প্রথম তার ইন্দোনেশিয়া সফর এই সফর তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তার এই সফর সফল হোক। এটাই কাঙ্খিত দেশবাসীর। বিশেষ করে এই সফরে ভারত-ইন্দোনেশিয়া বন্ধুত্ব দৃঢ় ও মজবুত হবে। এই আশা দেশের মানুষের। এই সফরে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তার মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ওই দেশের তিন চার্চে সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার কঠোর নিন্দা করেছেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইন্দোনেশিয়ার পাশে রয়েছে ভারত। তার এই মন্তব্য যথার্থ এবং সময়োচিত। প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য সারা বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে নতুন বার্তা দিল। এর প্রয়োজন ছিল। প্রসঙ্গত, ভারতের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়া সম্পর্ক বরাবরই মধুর। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের সময়ে দু'দেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অনেক চুক্তি হয়েছিল। এবারের সফরে প্রধানমন্ত্রীর মোদী মুসলিম প্রধান এই দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলায় জোর দেবেন। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট উইডুডু-র সঙ্গে তার বৈঠক ফলপ্রসূ হোক। দু'দেশের মানুষ এটাই চায়। বিশেষ করে ফি বছর কয়েক হাজার পর্যটক ইন্দোনেশিয়া যান। তেমনি ইন্দোনেশিয়া থেকে পর্যটকরা ভারতে আসুন। দু'দেশের পর্যটন শিল্প এই আদান-প্রদানে সমৃদ্ধ হোক। এটাই কাঙ্খিত।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

[সংসারী ভক্ত ও ত্যাগী ভক্ত]

''সংসারীদের ঈশ্বরানুরাগ ক্ষণিক–যেমন তপ্ত খোলায় জল পড়েছে, ছ্যাঁক করে উঠলো–তারপরই শুকিয়ে গেল।''

''সংসারী লোকদের ভোগের দিকে মন রয়েছে–তাই জন্য সে অনুরাগ, সে ব্যাকুলতা হয় না।''

''একাদশী তিন প্রকার। প্রথম–নির্জলা একাদশী, জল পর্যন্ত খাবে না। তেমনি ফকির পূর্ণত্যাগী, একবারে সব ভোগ ত্যাগ। দ্বিতীয়–দুধ সন্দেশ খায়–ভক্ত যেমন গৃহে সামান্য ভোগ রেখে দিয়েছে। তৃতীয়–লুচি ছক্কা খেয়ে একাদশী–পেট ভরে খাচ্ছে; হ'ল দু'খানা রুটি দুধে ভিজছে, পরে খাবে!''

''লোকে সাধন-ভজন করে, কিন্তু মন কামিনী-কাঞ্চনে, মন ভোগের দিকে তাই সাধন-ভজন ঠিক হয় না।''

''হাজরা এখানে অনেক জপ-তপ করত, কিন্তু বাড়িতে স্ত্রী, ছেলেপুলে, জমি এসব ছিল, কাজে কাজেই জপ-তপও করে; ভিতরে ভিতরে দলাদলিও করে। এ সব লোকের কথায় ঠিক থাকে না। এই বলে মাছ খাব না। আবার খায়!''

''টাকার জন্য লোকে কি না করতে পারে! ব্রাহ্মণকে, সাধুকে মোট বহাতে পারে।''

''সন্দেশ পচে যেত, তবু এসব লোককে দিতে পারতুম না। অন্য লোকের হেগো ঘটির জল নিতে পারতুম, এসব লোকের ঘটি ছুঁতুম না।''

'''এই স্ত্রী নিয়ে মানুষ কি না দুঃখ ভোগ করছে, তবু মনে করে যে এমন আত্মীয় আর কেউ নাই। কি দুরবস্থা! কুড়ি টাকা মাইনে–তিনটে ছেলে হ'য়েছে–তাদের ভাল করে খাওয়াবার শক্তি নাই, বাড়ির ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, মেরামত করবার পয়সা নাই–ছেলের নতুন বই কিনে দিতে পারে না–ছেলের পৈতে দিতে পারে না–এর কাছে আট আনা, ওর কাছে চার আনা ভিক্ষে করে!''

''বিদ্যারূপিণী স্ত্রী যথার্থ সহধর্মিণী। স্বামীকে ঈশ্বরের পথে যেতে বিশেষ সহায়তা করে। দু'-একটি ছেলের পর দুজনে ভাই-ভগিনীর মত থাকে! দুজনেই ঈশ্বরের ভক্ত–দাস দাসী। তাদের সংসার, বিদ্যার সংসার। ঈশ্বরই একমাত্র আপনার লোক–অনন্তকালের আপনার! সুখে-দুঃখে তাঁকে ভুলে না–যেমন পাণ্ডবেরা।''

দিনপঞ্জিকা

১৭ জ্যৈষ্ঠ, ভাঃ ১১ জ্যৈষ্ঠ, **১ জুন,** ১৭ জেঠ, সংবৎ ৩ জ্যৈষ্ঠ বদি অধিক, ১৬ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৪।৫৬, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৪। **শুক্রবার,** তৃতীয়া রাত্রি ঘ ১১।৪৭ মিঃ। পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র অহোরাত্র। শুভযোগ সন্ধ্যা ঘ ৬।১০ মিঃ। বণিজকরণ, দিবা ঘ ১০।৫০ গতে বিষ্টিকরণ, রাত্রি ঘ ১১।৪৭ গতে ববকরণ। **জন্মে**––ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। **মৃতে**– দোষ নাই। **যোগিনী**– অগ্নিকোণে, রাত্রি ঘ ১১।৪৭ গতে নৈর্ঋতে। **বারবেলাদি** ঘ ৮।১৬ গতে ১১।৩৫ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৮।৫৫ গতে ১০।১৫ মধ্যে। **যাত্রা**–– মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ঘ ১০।৫০ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ঘ ১০।৩৫ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, রাত্রি ঘ ১১।৪৭ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**-- দিবা ঘ ৮।১৬ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন গোবিক্রয়াদি। **বিবিধ**– তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ঘ ১১।৪৭ গতে মাসদগ্ধা। **মাহেন্দ্রযোগ**—দিবা ঘ ৫।৪৮ গতে ৬।৪২ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১০।১৭ মধ্যে। **অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ১২।৪ গতে ২।৪৫ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৮।২৭ মধ্যে ও ১২।৪০ গতে ২।৪৮ মধ্যে ও ৩।৩০ গতে ৪।৫৬ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৭ জ্যৈষ্ঠ, ভাঃ ১১ জ্যৈষ্ঠ, **১ জুন,** ১৬ রমজান, ১৭ জেঠ, উঃ ৪/৫৪, অঃ ৬/১৩, **শুক্রবার,** তৃতীয়া রা ঘ ১১/৪৬ মিঃ, সেহ্‌রী শেষ ৩/২০, ইফতার ৬/২২।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

শ্রীশ্রীমায়ের 'সোনার চাঁদ ছেলে' প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তশিষ্যদের কাছে 'প্রবোধবাবু', 'প্রবোধ' বা 'প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' নামটি বিশেষভাবে পরিচিত। আদর্শ শিক্ষক এই প্রবোধচন্দ্র ছিলেন সস্ত্রীক শ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত মন্ত্রশিষ্য ও তেজস্বীভক্ত। তিনি শ্রীমায়ের 'সোনার চাঁদ ছেলে' এবং অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। একদিন শ্রীমা কথা প্রসঙ্গে উপস্থিত প্রবোধবাবু প্রমুখ ভক্তদিগকে দেখিয়ে পাগলীমামিকে বলেছিলেন, ''দেখ্ দিকিনি, আমার কত শত সোনার চাঁদ ছেলে।'' প্রবোধচন্দ্র জয়রামবাটী ও কোয়ালপাড়ায় বহুবার শ্রীমায়ের সান্নিধ্যে এসে তাঁর পারিবারিক সুখ-দুঃখের অংশভাক্ হতেন। প্রবোধচন্দ্রের অনুরোধে শ্রীমা 'শ্যামবাজার' গ্রামে তাঁর বাড়িতে এলে সারা পরিবার শ্রীমায়ের পাদপূজা করে ধন্য হয়েছিলেন। শ্রীমা প্রবোধের জ্যেষ্ঠপুত্র গণেশের (গনু, দেবীপ্রসাদ) মুখে নিজের প্রসাদ দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যজী লিখেছেন, 'প্রবোধবাবু বলেন, আমাদের প্রার্থনায় শ্রীশ্রীমা আমার জ্যেষ্ঠপুত্রের মুখে নিজের প্রসাদ দিয়াছিলেন। বিকালে যখন সকলে তাঁহার কাছে বসিয়াছি মা বলিলেন, ''অন্নপ্রাশন তো হল বাবা, হল কিন্তু রবিবারে''! জিজ্ঞাসা করিলাম, রবিবারে হলে কী হয় মা? মা বলিলেন, ''আর কিছু হয় না, একটু গরিব হয়''। তারপরে প্রসন্নদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, ''বামুনের ছেলে—একটু বৈদিক কার্য কত্তে হয়, সংস্কার কিনা, বাড়িতে গিয়ে একটু ঘি পুড়িয়ো''।'

প্রবোধচন্দ্র ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বোনের নাতি। শ্রীমাকে প্রথম দর্শনের পর স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী বলেছেন, 'প্রথমে জ্ঞানদা (স্বামী জ্ঞানানন্দ), তারপরে গোপেশদা (স্বামী সারদেশানন্দ), তারপরে আমি যখন প্রণাম করলাম, মা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে ওঁদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, ''এই ছেলেটি কে?'' তা আমার আর কি পরিচয়! ওঁরা বললেন, 'বদনগঞ্জ স্কুলে পড়ে।' মা বললেন, ''ওঃ! প্রবোধের ছাত্র?'' আমার হেডমাস্টার মশাইয়ের নাম প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বোনের নাতি। ভাবলাম, মা আমার হেডমাস্টার মশাইকে কি করে জানলেন?'

ব্যক্তিত্বের ব্যাপ্ত বিশালতা, সহজাত নেতৃত্বশক্তি, বিদ্য অন্তর্দৃষ্টি, অধ্যাত্মশক্তি অমেয়মহিমা প্রবোধচন্দ্রের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। সেইজন্য শ্রীমা সাংসারিক ব্যাপারে তাঁর এই স্নেহধন্য শিষ্যটির উপর যেমন অনেকখানি নির্ভর করতেন, তেমনি শরৎ মহারাজও (স্বামী সারদানন্দ) তাঁর উপর অনেক কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন।

প্রবোধচন্দ্র গোঘাট থানার বদনগঞ্জের সন্নিকটে 'শ্যামবাজার' নামক গ্রামে ১৮৮৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা থাকমনিদেবী ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাইঝি। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বিদুষী ছিলেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা পালিতা হয়েছিলেন। পিতা ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলকাতায় মেট্রোপলিটন স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এই বিদ্যালয়েরই প্রধান শিক্ষক ছিলেন কথামৃতকার 'শ্রীম'। পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন প্রবোধচন্দ্র। তাঁদের বাড়ির আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকলেও প্রবোধচন্দ্র নিজের প্রচেষ্টায় তখনকার দিনে বি.এ. পাশ করেছিলেন। সেই সময় স্বদেশী যুগ, দেশের কাজে তাঁর খুব আগ্রহ। আরামবাগের সাবডেপুটি কালেক্টর পদে কাজ করবার সুযোগ পেয়েও প্রবোধচন্দ্র প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

প্রবোধচন্দ্র প্রথমে হরিপাল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। পরে আরামবাগ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হন। এই সময় আরামবাগ আদালতের ব্যবহারজীবী রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র সাতকড়ি (পরবর্তীকালে স্বামী অসিতানন্দ) এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু অজ্ঞাতকারণে এখানে ইস্তফা দিয়ে প্রবোধচন্দ্র কুচিয়াকোল উচ্চ বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এর কিছুদিন পরে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে নিজ জন্মস্থানের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বদনগঞ্জ গ্রামে কিছু সহৃদয় ব্যক্তির সহযোগিতায় বদনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি নিজে শ্যামবাজার থেকে বাঁশ, বাঁখারি, খড়, দড়ি ইত্যাদি মাটির বাড়ি তৈরির সরঞ্জাম কাঁধে করে বহন করে নিয়ে গিয়ে বিদ্যালয়টি তৈরি করেছেন। শ্রীমায়ের নির্দেশেই এতদঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা তাঁকে পেয়ে বসে। নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই স্কুলে প্রতিষ্ঠাপূর্বক তিনিই প্রধান শিক্ষক হন।

বদনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় জন্মলগ্ন থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় প্রতিপালিত এবং পার্ষদদের আশীর্ব্বাদধন্য। স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের একাধিকবার শুভ পদার্পণ ঘটেছিল এই বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের জ্ঞানপিপাসু ছাত্র ছিলেন রামময় (স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ), অমূল্য (স্বামী ধ্রুবানন্দ) এবং রাখালচন্দ্র কর্মকার। এই রাখালচন্দ্র পরে বিদ্যালয়েরই নামী শিক্ষক হন। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ সারদানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য। প্রবোধচন্দ্র ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি-বিশ্বাসের বলেই বলীয়ান। ছাত্ররা শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শে নির্ভীক হয়ে গড়ে উঠুক, সমাজের সেবায় স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসুক—এই ছিল তাঁর শিক্ষকজীবনের মূলমন্ত্র। শিক্ষকজীবনের এক নাগাড়ে প্রায় ৪০ বছর ধরে শিক্ষকতার মহানব্রতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রবোধচন্দ্র ব্রতী ছিলেন।

পূর্বে 'শ্যামবাজারে' মিউনিসিপ্যালিটি ইউনিয়ন ছিল। পরে শ্যামবাজার অঞ্চল পঞ্চায়েত ঘটিত হয়। প্রবোধচন্দ্র তখন শ্যামবাজার পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট। শ্রীমায়ের কাছে গ্রাম দেখে এসে নিজ অভিজ্ঞতার কথা তিনি বলছেন, 'খুব কষ্ট লোকদের। পরনে কাপড় নেই—আমাদের সামনে বেরুতে পারলে না। চালে খড় নেই।' শ্রীমা তখন খোঁজ নিচ্ছেন তাদের রান্নার চাল ও কাপড় দেওয়া হয়েছে কিনা? তখন দেশে চলছে দুর্ভিক্ষ। ধান, কাপড়, তেল প্রভৃতি সামগ্রীর চড়া দাম। শ্রীমায়ের বেদনার্ত হৃদয়ের অনুভূতি এবং তখনকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাজারদরের একটা ছবি শ্রীমায়ের কথা থেকে চোখে পড়ে। প্রবোধচন্দ্রের মধ্যমপুত্র শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আমার বাবা শ্রীশ্রীমায়ের উৎসাহে ও প্রেরণায় ঐ দরিদ্র অনুন্নত অঞ্চলে বদনগঞ্জ গ্রামে তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। . . . বাবা ঐ অঞ্চলের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টও ছিলেন।'

স্বামী সারদেশানন্দজী লিখেছেন, 'শ্যামবাজারের প্রবোধবাবু মায়ের বিশেষ স্নেহের পাত্র। বদনগঞ্জ হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক প্রবোধবাবু ঐ অঞ্চলে সম্মানিত, সুপরিচিত। কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থানের সংলগ্ন জমি 'গোঁসাইয়ের ভিটা' ক্রয় করিয়া মন্দির-আশ্রমাদি প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজ ঐ জমির মালিক লাহাবাবুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভার প্রবোধবাবুর উপরে দিয়াছেন। প্রবোধবাবু সেজন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে কামারপুকুরে যাতায়াত করেন। মাতা ঠাকুরাণীরও ঐ বিষয়ে আগ্রহ রহিয়াছে, সেজন্য প্রবোধবাবু সময় সময় আসিয়া তাঁহাকে খবর দিয়া যান, কতদূর কি হইল।' প্রবোধবাবু কামারপুকুরে প্রাক্ শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থানে মন্দির করবার জন্য যে নূতন জমি কেনা হয়েছে, তা নিয়ে তখন গোলমাল হচ্ছিল। এই ব্যাপারটির দেখাশোনার ভার ছিল প্রবোধচন্দ্রের উপরে। নিজে কোনো সিদ্ধান্তে না পৌঁছে অনুগতদাসের মতো সমস্ত ঘটনা পত্রে শরৎ মহারাজকে জানাতেন এবং তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতেন। স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী বলেছেন, 'শরৎ মরাহাজ আমার প্রধান শিক্ষক মশাইকে লিখলেন, 'প্রবোধ, জমিটা তো কেনা হল, এখন দখল নিতে হবে তো? আমি টাকা দিব, তুমি জমিটিকে পরিষ্কার করিয়ে চারিদিকে বেড়া দিয়ে কোণায় একটি পাকা পিলার গাঁথিয়ে দাও।' তখন শিবুদা, বৌদি ও তাঁদের ছেলে ও মেয়ে কামারপুকুরে থাকতেন। মাস্টারমশাই আমার উপরই দায়িত্ব দিলেন। জায়গায় অনেক কাঁটাগাছ ও গর্ত ছিল। মজুর দিয়ে জমিটিকে সমান করলাম। কথামৃতকার 'শ্রীম' প্রবোধচন্দ্রকে বিশেষ সম্মান করতেন। ইতিপূর্বের একটি ঘটনা— 'বৈকালে মাস্টার মহাশয় ও প্রবোধবাবু কামারপুকুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম মাস্টার মহাশয়ের ঠাকুরের বাড়ি দেখিয়াই চোখে জল। গাড়ি বাড়ির দরজায় থামিল। . . . তাঁহারা কামারপুকুরে রঘুবীরের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া জয়রামবাটী রওয়ানা হইলেন। . . . বিষ্ণুপুরে মাস্টার মহাশয়, প্রবোধবাবু প্রভৃতি লালবাঁধে মৃন্ময়ীদেবী দেখিতে গেলেন।'

আদর্শ শিক্ষক প্রবোধচন্দ্রের নিবিড় স্নেহময় সান্নিধ্য যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা যারপরনাই উপকৃত হয়েছেন। তিনি নিজে যেমন নৈতিক চরিত্রের বলে বলীয়ান ও তেজস্বী ছিলেন, তেমনি তাঁর সকল ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রের উপর প্রখর দৃষ্টি দিতেন। ছাত্রদেরকে মিষ্ট কথায় বুঝিয়ে তাদের ভ্রম সংশোধন করে দিতেন। তাঁর মতে, মধুর ভাষায় শাসনই, মার-ধোর-গালাগালি দিয়ে শাসনের থেকে অধিকতর মূল্যবান ও হিতকর। তিনি কখনো কোনো অন্যায়ের কাছে নতিস্বীকার করেননি। তিনি ছিলেন ত্যাগী ও নিরাভিমানী। মানযশের আকাঙ্ক্ষা প্রবোধচন্দ্রের ছিল না কোনকালে, ছিল অনাড়ম্বর সরল জীবন। শেষ জীবনে তিনি বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা করে সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। সাংসারিক সমস্ত কর্ম সম্পাদন এবং সেই সঙ্গে শ্রীমায়ের আশীর্ব্বাণী অন্তরে ধারণ করে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি ৬২ বছর বয়ঃক্রমে শ্রীমায়ের চরণে লীন হন। তাঁর সহধর্মিণী সুগন্ধ্যাবালাও শ্রীমায়ের স্নেহধন্যা ও কৃপাপ্রাপ্তা ছিলেন। তাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্র গণু (দেবীপ্রসাদ) উত্তরকালে কলকাতার বিদাসাগর কলেজের লাইব্রেরিয়ান হয়েছিলেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। জ্যেষ্ঠাকন্যা বীণাপানি নিবেদিতা স্কুলে পাঠরতা ছিলেন। তাঁদের তিনপুত্র ও তিন কন্যা সকলেই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শে পবিত্রভাবে ভাবিত ও আশ্রিত। প্রবোধচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার নিমিত্ত আজও বদনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে স্মৃতিসৌধ বিরাজ করছে এবং 'প্রবোধ' নামে বিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়ে আসছে।

যোজনা ডায়েরি

২১ ডিসেম্বর–জানুয়ারি ২০১৮

পর্ব ৯

● ১.২ লক্ষ সংস্থার নথিভুক্তি খারিজ হচ্ছে :

কালো টাকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আরও ১.২ লক্ষ সংস্থার নথিভুক্ত বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। বিভিন্ন আইন ভাঙার দায়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রকের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। ওই সব সংস্থার নথিপত্র খতিয়ে দেখতে কোম্পানি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী পি. পি. চৌধুরির নেতৃত্বে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট অফিসারদের নির্দেশ দিয়েছেন।

গত ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ২.২৬ লক্ষেরও বেশি সংস্থার নাম কাটা গিয়েছে রেজিস্ট্রার অব কোম্পানিজের খাতা থেকে। পদ হারিয়েছেন ওই সব সংস্থার ৩.০৯ লক্ষ ডিরেক্টর। তবে এর মধ্যে ১,১৫৭-টি সংস্থা জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনালে (এনসিএলটি) আবেদন দাখিল করেছে। আইন মেনে চলার অঙ্গীকার করে ফের

ব্যবসা শুরুর আর্জি জানিয়েছে তারা। ১৮০-টি সংস্থাকে ঝাঁপ খোলার অনুমতিও দিয়েছে এনসিএলটি, যার মধ্যে চালু হয়েছে ১২০-টি। পাশাপাশি, ডিরেক্টরদের পদচ্যুত করা সংক্রান্ত ৯৯২-টি মামলা হয় বিভিন্ন হাইকোর্টে। কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রক জানিয়েছে, এর মধ্যে ১৯০-টি মিটে গিয়েছে।

● ব্যাঙ্কে ৭,৫৭৭ কোটি মূলধন জোগাতে সায় :

ছ'টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৭,৫৭৭ কোটি টাকার মূলধন জোগানোর প্রস্তাবে ৩ জানুয়ারি সিলমোহর দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। আগামী ২০১৯ সাল পর্যন্ত এধরনের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে ৭০ হাজার কোটি টাকার মূলধন জোগাতে মোদী সরকারের ইন্দ্রধনুষ প্রকল্পের আওতায় এই তহবিল জোগাতে হবে। আর্থিক স্বাস্থ্য ফেরানোর জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াই ব্যাঙ্কগুলিকে চিহ্নিত করেছে। এই ছ'টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের তালিকায় হয়েছে : ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (মূলধনের অঙ্ক ২,২৫৭ কোটি), আইডিবিআই ব্যাঙ্ক (২,৭২৯ কোটি), ইউকো ব্যাঙ্ক (১,৩৭৫ কোটি), সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক (৩২৩ কোটি), ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র (৬৫০ কোটি) এবং দেনা ব্যাঙ্ক (২৪৩ কোটি)।

এই ছ'টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে কেন্দ্র আগেভাগে মূলধন জোগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাতে তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম ও ব্যবসা চালাতে অসুবিধা না হয়। ২০১৫ সালে ঘোষিত ইন্দ্রধনুষ প্রকল্পে চার বছরে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৭০ হাজার কোটি মূলধন জোগানোর কথা কেন্দ্রের। আন্তর্জাতিক বাসেল-৩ বিধির শর্ত মানতে বাজার থেকে তাদের সংগ্রহ করতে হবে আরও ১.১ লক্ষ কোটি টাকা। গত সাড়ে তিন বছরে কেন্দ্র জুগিয়েছে ৫১,৮৫৮ কোটি।

● এবার ঘরে বসেও আধার দিয়ে মোবাইল নম্বর যাচাই :

এখন ঘরে বসেও আইভিআর (ইন্টারঅ্যাকটিভ ভয়েস রেসপন্স) পদ্ধতিতে মোবাইল নম্বরের সঙ্গে আধারের তথ্য যোগ করার সুযোগ মিলছে। টেলিকম দফতরের (ডট) নির্দেশ মেনে নতুন বছর থেকে তা চালু করল একাধিক সংস্থা। ভুয়ো গ্রাহক ধরতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে দোকানে সিম বা ফোন নম্বর যাচাইয়ের প্রক্রিয়া চালাচ্ছিল টেলি সংস্থাগুলি। তবে এবার থেকে বাড়ি থেকেও তা করা যাবে।

ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

ভ্রমণেই অনেক কিছুর কথা জানা যায়

ভ্রমণ মানে একটা আলাদা আনন্দ, সেই আনন্দের সাথে নতুন কিছু দেখা, সেটা আরো বেশি আনন্দ লাগে। সেই নতুন প্রাপ্তির মধ্যেই আনন্দটাকে আরো বেশি করে উপভোগ করি। অন্ধপ্রদেশে এলেই বিশাখাপত্তনমে যাই। এখানে একটা কালী মন্দির রয়েছে। দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী মন্দিরের আদলে তৈরি করা হয়েছে এবং নাম রাখা হয়েছে নবরত্ন মন্দির। জানা যায়, কন্যাকুমারীর একসময় নাম ছিল কেপ কমোরিন। মাদুরাই এই জায়গাটার নাম পূর্বে ছিল মধুরাপুরী। মধুরাপুরী থেকে মাদুরাই নামটা হয়েছে। উদয়গিরির সাথে আমাদের পরিচয় আছে উড়িষ্যার সাথে। উদয়গিরি নাম নিয়ে রয়েছে মধ্যপ্রদেশেও। ঔরঙ্গাবাদ খুব পরিচিত নাম। এই শহরের আদি নাম ছিল খাকে। গুজরাটের বন্দর শহর পোরবন্দর। একসময় নাম ছিল সুদামাপুরী। গুজরাটের দ্বারকাও প্রসিদ্ধ স্থান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি বিজরিত এই অঞ্চলের পূর্বের নাম ছিল কুশস্থলী। রাজস্থানের জয়পুর, যা রাজধানী বলা হয়। এই শহরে পূর্বের নাম ছিল জয়নগর। উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউ। পূর্বে এর নাম ছিল লক্ষনাবতী। আগ্রা মানেই তাজমহল। সেই আগ্রার পূর্বের নাম ছিল অগ্রবন। হিমাচলে গেলেই মানালীতে আসবোই। এই মানালীর পূর্বের নাম ছিল মানালসু। পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে মায়াপুর। সেখানে গেলে ইসকনের মন্দির দেখা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাওয়া যায়। সেই মায়াপুরের পূর্বের নাম ছিল মিয়াপুর। শিবপুর হাওড়াতে একসময় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বসবাস করতেন। আজও তাঁর নামে শরৎ চ্যাটার্জী লেনটা রয়েছে। এই অঞ্চলটাকে বর্তমানে বলে বাজে শিবপুর। বাজে মানে মন্দকথা বলা হয়। আসলে এই অঞ্চলে এক সময় বাজনদাররা থাকতেন। একটা সঙ্গীতের মহফিল ছিল। সেই জন্যই অঞ্চলটার নাম ছিল বাজিয়ে শিবপুর। হাওড়া জেলার একটা জায়গার নাম আমতা। আজও আমতা এলে কলকাতা নামের গ্রামটার সাথে দর্শন হয়ে যাবে। শালিখা একটা ছোট্ট গ্রামের নাম ছিল। এটাও হাওড়া জেলাতেই অবস্থিত। আজ সেই গ্রামটার শহরে পরিণত হয়েছে এবং নাম হয়েছে শালকিয়া। চ্যাংড়া পোতা গ্রামটির নাম ছিল। জানকীনাথ বসু এখানে বাড়ি করেছিলেন। আজও সেই বাড়ি আছে। তবে চ্যাংড়াপোতা নামের বদলে সুভাষগ্রাম নাম হয়েছে। অনেক কিছুই বদলে যায় সময়ের সাথে সাথে। তাই এগুলিরও নাম বদল হয়েছে।

প্রবীর মিত্র
হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়